ভূমিকা

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪ খ্রী: - ১৯৬২ খ্রী:) বাংলার পাঠক-সমালোচকদের কাছে আজ বিস্মৃত প্রায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা উপন্যাস সাহিত্য নিয়ে লেখা বইগুলিতে রমেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। সুকুমার সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সামান্য কিছু আলোচনা করেছেন।

এমন একজন লেখককে বেছে নিয়ে কেন গবেষণা কর্মে নিযুক্ত হলাম, সে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী প্রথম আমাকে রমেশচন্দ্রের ওপর কাজ করবার পরামর্শ দেন। কারণ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে একজন অজ্ঞাত লেখককে নিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। বিস্মৃতির গর্ভ থেকে কোনো কিছু আবিষ্কার করার আনন্দ অনেক। আবার ঝুঁকিও অনেক। কেননা সেক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে সহায়ক উপকরণাদি অনেক সময়ই ঠিক ঠিক মতো পাওয়া যায় না। রমেশচন্দ্র সেনের ব্যাপারেও তেমনটি হয়েছে। তাঁর লেখা দিনলিপি বা ডায়েরি কিংবা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি তার গ্রন্থগুলি বাজারে আজ দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি অরুণা প্রকাশনী থেকে 'কুরপালা' এবং দীপায়ন প্রকাশনী থেকে দুই খন্ডের রচনাবলী (প্রথম খন্ডে 'শতাব্দী' উপন্যাস, দ্বিতীয় খন্ডে 'গৌরীগ্রাম' উপন্যাস) প্রকাশিত হয়েছে। আসানসোলের প্রথমত সাহিত্যগোষ্ঠী থেকে তাঁর 'দীপক' ও 'সেলারিনা' উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্রের সর্বমোট তের খানা উপন্যাসের মধ্যে মাত্র এই পাঁচটি গ্রন্থ আজ অনেকটা সুলভ।

ডঃ লাহিড়ীর উৎসাহে আমি ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে গিয়ে রমেশচন্দ্রের রচনা নিয়ে খোঁজ খবর করি। এবং সেখানে ছোটগল্প সংকলনে তাঁর 'যৈবন' গল্পটির সন্ধান পাই। গল্পটি পড়ে ভালো লাগে। অতঃপর কোলকাতায় গিয়ে অরুণা প্রকাশনী থেকে 'কুরপালা' সংগ্রহ করি। 'কুরপালা' পড়ে মনে প্রতীতী জন্মে যে গ্রাম বদলের, সমাজ বদলের ব্যাখ্যাকার রমেশচন্দ্র তারাশঙ্করের ধারার একজন লেখক। ফলে তিনি বিস্মৃতির গর্ভে লুকিয়ে থাকবার মতো নন। অতঃপর কোলকাতার দীপায়ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দুটি খন্ড এবং রমেশচন্দ্রের বড় ছেলে শ্রী মিহির সেনের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে অন্যান্য গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি নিয়ে ফিরে আসি। এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্যে নাম নথিভুক্ত করি।

রমেশচন্দ্র সেন উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের লেখক। তাঁর লেখায় সেদিনকার যুগ জীবনের ছায়া যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি ভাবী কালের আগমনীও ধ্বনিত হয়েছে। একদিকে সামন্ত্রতন্ত্র ভেঙে যাচ্ছে, ধনতন্ত্রের সূচনা ঘটছে, আবার ধনতন্ত্রের বুকেই সমাজতন্ত্রের সুর শোনা যাচ্ছে — কালের এই চলমানতাকে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই দিক থেকে তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যে একজন অগ্রগণ্য লেখক তা আমরা আলোচনা করেছি।

আমরা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের শিরনাম দিয়েছি 'ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র সেন ঃ সমাজ ভাবনা ও শিল্পসিদ্ধি'। বলাবাহুল্য সমাজ ও সময়ের কথা মনে রেখে তাঁর উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণা আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে আমার পক্ষে এই কাজ করা দুষ্কর হতো। এই গবেষণা কর্মে আমি অনেকের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের সবার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক বন্ধু নিখিলেশ রায়ের কথা প্রথমে মনে আসে। সে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে গ্রন্থ ব্যবহারে সাহায্য করেছে। ঋণ স্বীকার করতে হয় বন্ধু সুব্রত দাস ও সুদর্শন আইচের কাছে। এরা দুজনই আমাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে গ্রন্থ যোগান দিয়ে এবং হতাশ হয়ে পড়ার মুহূর্তে উৎসাহ দিয়ে গবেষণা কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। বন্ধু ভানু রায়ও সময়ে অসময়ে সঙ্গ দিয়ে চিন্তার জটকে খুলতে সাহায্য করেছে। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'এবং এই সময়' (রমেশচন্দ্র সেন সংখ্যা) এবং 'কুরপালার অন্তর্বয়ন' পত্রিকা দুটি দিয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। আসানসোলের 'প্রথমত'র সম্পাদক মানবেন্দু রায় রমেশচন্দ্র সম্পর্কে কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন সাপটগ্রাম (অসম) কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ তপতী সাহা। ডুমডুমা (অসম) কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ মিতালী দত্ত আমাকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়েছেন। দুলিয়াজান কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রণতি ব্যানার্জীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক ডঃ দিলীপ রায় গবেষণা বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। সততই প্রেরণা দিয়েছে আমার স্ত্রী চন্দনা এবং ভগ্নীপ্রতীম শ্রীমতী সুস্মিতা ভট্টাচার্য। তাছাড়া বাবা-মা আমাকে তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় রেখে গবেষণা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

বিশেষ সাহায্য করেছেন। সঞ্জয়'স ইম্প্রেশনের শ্রীমতী গার্গী দেবনাথ তার আন্তরিক সহযোগিতায় গবেষণাপত্রটি ছেপে দিয়ে আমার কাজের গতি ত্বরান্বিত করেছেন। ফলে তাকে ধন্যবাদ জানাই।

এ গবেষণার জন্যে আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়েছে। কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ফালাকাটা কলেজের লাইব্রেরী, ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগার, তিনসুকিয়া মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মংপু রবীন্দ্র গ্রন্থাগার তারমধ্যে উল্লেখ্যনীয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের সৌজন্য ও সহযোগিতার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা দরকার - গবেষণা অভি সন্দর্ভ রচনার জন্যে সূত্র নির্দেশিকা দেবার দুটি রীতি প্রচলিত আছে। প্রথমটিতে অধ্যায়ের শেষে সংখ্যা চিহ্নগুলি অনুসরণ করে সূত্র নির্দেশ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে অধ্যায়ের মূল রচনার মধ্যেই সংক্ষেপে গ্রন্থ নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আমি এই অভি সন্দর্ভ রচনায় মূল রচনার মধ্যেই সূত্র নির্দেশ করেছি।